নবীজি ﷺ

যেমন ছিলেন তিনি

সমকালীন প্রকাশন

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।[১]

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ২১

সূচীপত্র

নবীজির নাম	২১
নবীজির বংশ	২৩
নবীজির জন্মভূমি	২৪
নবীজির শৈশব	২৬
নবুওয়াত	৩১
ধর্ম	৩৭
ঐশীগ্রন্থ	৪০
নবীজির সত্যবাদিতা	৪৩
নবীজির ধৈর্য	৪৭
নবীজির মহানুভবতা	৫০
নবীজির সাহসিকতা	৫৪
নবীজির আত্মত্যাগ	৫৮
নবীজির বিনয়	৬৪
নবীজির সহনশীলতা	৭০

নবীজির দয়া ৭৫
আল্লাহর স্মরণ ৮৪
নবীজির প্রার্থনা ৮৭
নবীজির লক্ষ্য ৯১
কুরআনের ভাষায় নবীজি ৯৩
নবীজির কান্না ১১৩
প্রাণজুড়ানো হাসি ১১৯
নবীজির বীরত্ব ১২৪
তার প্রশংসায় ১২৭
নবীজির বাগ্মীতা ১৩৮
সমাধান প্রদান ১৪৪
চারিত্রিক শুচিতা ১৫১
নবীপ্রেম ১৬০
কল্যাণের আধার ১৬৮
দায়িত্ববান অভিভাবক ১৭৪
দরূদের আবশ্যকতা ১৮১
সম্মান প্রদর্শন ১৮৫
মহান সুসংবাদদাতা ১৮৮
আদর্শ শিক্ষক ১৯৪
লেখক-পরিচিতি ২০০

নবীজির নাম

মুহাম্মাদ—একটি প্রতীকী নাম। অর্থ—চিরপ্রশংসিত। এই একটিমাত্র নামের মাঝে তার সকল পরিচয় বাঙময় হয়ে ওঠে। কারণ, সর্বকালের সবার কাছে প্রশংসিত হতে হলে উন্নত নীতি-নৈতিকতা, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি, সমুন্নত মানবিক মূল্যবোধ, অসম সাহসিকতা, অনিঃশেষ দয়া এবং ইহকালীন ও পরকালীন সংকট মুকাবেলায় অনুসারীদের যুগান্তকারী দিক-নির্দেশ প্রদানের অসামান্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। তবেই একজন মানুষ সকল যুগের সবার কাছে স্মরণীয়, বরণীয় ও প্রশংসিত হতে পারে।

তার আরেকটি নাম হলো আহমাদ—এই নামটিও একটি প্রতীকী নাম। অর্থ—অত্যধিক প্রশংসিত। 'আহমাদ' ও 'মুহাম্মাদ' একই ধাতুমূল থেকে উৎসারিত দুটি শব্দ। তার প্রশংসা ও গ্রহণযোগ্যতাকে সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা দেওয়ার জন্যই এই নামের উদ্ভব হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম তার এই গুণবাচক নামটি উল্লেখ করে স্বজাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

> **শীঘ্রই 'আহমাদ' নামের একজন নবী আসবেন; তিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করবেন।**

এছাড়াও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেশ কয়েকটি গুণবাচক নাম রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আল আকিব', 'আল হাশির', 'আল মাহী', 'আল-খলীল', ইত্যাদি।

‘আল আকিব’ বলতে সাধারণত সূত্রের শেষ অংক, অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব এবং বংশীয় বা অন্যকোনো ধারার সর্বশেষ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। তিনি যেহেতু সকল নবীর পরে আগমন করেছেন এবং তার আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারার সুসমাপ্তি ঘটেছে, তাই তাকে ‘আল-আকিব’ বলা হয়।

‘আল হাশির’ বলতে সাধারণত ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয়, যাকে কেন্দ্র করে কোনো সম্মিলন বা অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। যেহেতু হাশরের ময়দানে তিনিই প্রথমে উত্থিত হবেন এবং অন্যদের তার পরে উত্থিত করা হবে সেহেতু তাকে ‘আল-হাশির’ বলা হয়।

‘আল মাহী’ নামের অর্থ হচ্ছে নিশ্চিহ্নকারী। যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবী হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সকল প্রকার অবিশ্বাসকে দূরীভূত করেছেন সেহেতু তাকে এই নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

আর ‘আল-খলীল’ নামের অর্থ হচ্ছে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও একান্ত প্রিয়ভাজন। আরেকটু ব্যাখ্যা করে বললে, যাকে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসলেও আশা মেটে না এবং যাকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করলেও শেষ পেয়েছি বলে মনে হয় না, সে-ই হলো খলীল—অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে, স্বয়ং আল্লাহ যাকে মানব-বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি অবশ্যই সর্বদিক থেকে প্রশংসিত হবেন। মানুষের আশ্রয়স্থল হবেন। করুণার আধার হবেন। দুস্থের সহায় হবেন। বৃদ্ধের হাতের লাঠি হবেন। অন্ধের চোখের আলো হবেন এবং সকল বিষয়ে ও জীবনের সকল পর্যায়ে ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

বাস্তবেও তাই হয়েছে। নবুওয়াতের ছোঁয়া তার এই উন্নত ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ এবং সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণকামিতার অনন্য সাধারণ গুণাবলিকে পূর্ণতা দান করেছে। তিনি জনবিচ্ছিন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন সাধক থেকে চালকের আসনে উন্নীত হয়েছেন। অনুসারী থেকে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মহান আল্লাহর কৃপায় নিজেকে বিশ্ববাসীর জন্য করুণার আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এজন্য সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকেছেন।

সুতরাং, যতদিন আকাশের তারাগুলো দ্যুতি ছড়াবে, যতদিন প্রভাতের মৃদুসমীরণ বয়ে যাবে, যতদিন পাখ-পাখালির কল-কাকলিতে পৃথিবী মুখরিত থাকবে, ততদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীদের ওপর অবিরাম শান্তি বর্ষিত হোক।

নবীজির শৈশব

এমনটা কিন্তু হয়নি যে, চল্লিশ বছর বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশ থেকে অবতরণ করে ইসলাম প্রচার শুরু করে দিয়েছেন; বরং তিনি সাধারণ শিশুর মতোই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। বাবার ঔরসে তার জন্ম এবং মায়ের গর্ভে নয় মাস কাটিয়ে এ পৃথিবীতে তার আগমন। স্বাভাবিক মানুষের বয়স যে-রীতিতে বাড়ে, তারও বেড়েছিল সেভাবেই। এমন নয় যে, তার ক্ষেত্রে সময় দ্রুত বয়ে গেছে, আর তিনি হঠাৎ করে চল্লিশে উপনীত হয়েছেন; বরং অন্য মানুষ যেভাবে বেড়ে ওঠে—শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে পরিণত হয়—তিনিও ঠিক সেভাবেই বেড়ে উঠেছিলেন।

শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন ছিলেন? সহজ ভাষায় বললে, তিনি 'স্বাভাবিক' শিশু ছিলেন; কিন্তু 'সাধারণ' ছিলেন না। তিনি একই সাথে নিষ্পাপ ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। ধীমান ও পবিত্র ছিলেন। অন্য শিশুদের সাথে তার পার্থক্য শুধু এখানেই যে, তিনি আল্লাহ কর্তৃক সব ধরনের বিকার ও বিপদ থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। শিশু মুহাম্মাদকে আল্লাহ তাআলা আসন্ন জীবনের সুবিশাল দায়িত্বসমূহের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। শৈশবে তিনি যারই সান্নিধ্যে গিয়েছেন, সে-ই বুঝেছে যে, এই শিশুকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে; কিন্তু সে-উদ্দেশ্য যে কী, সেটা কেবল জানতেন আবু তালিব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যান্য অভিভাবক—মা হালিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বা আব্দুল মুত্তালিব—কেউই সে-কথা জানতেন না।

আবু তালিবের জানার কারণ হলো, একবার সিরিয়া-যাত্রায় তিনি শিশু মুহাম্মাদকে সঙ্গে নেন। সেই যাত্রায় এক ধর্মযাজকের সঙ্গে আবু তালিবের দেখা হয়। ধর্মযাজক মুহাম্মাদের পিঠে নবুওয়াতের মোহর দেখে তাকে চিনে ফেলেন এবং আবু তালিবকে সতর্ক করে বলেন—'এই বালকটিই প্রতিশ্রুত শেষ-নবী। তাওরাত ও ইঞ্জিলে এরই আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এই সংবাদটি যেন একান্ত গোপন থাকে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আসমানী সুরক্ষায় সুরক্ষিত। এর মানে এই নয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল বাহ্যিক বা শারীরিক দিক থেকে সুরক্ষিত ছিলেন; বরং সবার আগে আল্লাহ তাকে অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিক থেকে সুরক্ষিত করেছিলেন। এজন্যই শৈশব, কৈশোর ও তৎপরবর্তী জীবনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাঝে কখনোই নীচতা, হীনতা, মিথ্যের আশ্রয় বা দুর্ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি; এমনকি শিশুদের ছেলেমানুষিও প্রকাশ পায়নি। এগুলো থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। তার চরিত্রে কোনো কলুষ বা কালিমা ছিল না। এভাবেই তাকে মানবজাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। তাই তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষ হয়েও নবী হওয়ার অত্যুচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ওহীর মাধ্যমে মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার গুরুদায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক বিবেচনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুধু একজন নেতা বলে থেমে গেলে ভুল হবে। কারণ, দুনিয়ায় অজস্র নেতা এসেছে; আবার চলেও গেছে। ক্ষমতার মোহ ও ধন-সম্পদের লোভ তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। কেউ তাদের মনে রাখেনি। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সারির কোনো নেতা ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন নবী। একজন পাঞ্জেরী। ক্ষমতা ও সম্পদের লিপ্সা কখনোই তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। তিনি যাবতীয় লোভ-প্রলোভন ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে আমাদের আলোর দিশা দিয়েছেন। সত্য ও সুন্দরের পথ দেখিয়েছেন। অন্যান্যদের মতো তিনি তার চিন্তা ও কর্মতৎপরতাকে কেবল পার্থিব-জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং দুনিয়ায় থেকে কীভাবে আখিরাতকে সুখময় ও সৌভাগ্যমণ্ডিত করা যায়—সেই চেষ্টাও করেছেন। অধিকন্তু আখিরাতের সুখ ও সৌভাগ্যকেই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি শুধু বাহ্যিক আচরণেরই সংস্কারক ছিলেন না; বরং ছিলেন আত্মোন্নয়নের মহান কারিগর।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। তিনি এই জ্ঞান শুধু নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মূর্খকে জ্ঞানের আলো দিয়েছেন। চিন্তকের চিন্তাকে শাণিত করেছেন। প্রজ্ঞাবানকে সমৃদ্ধ করেছেন। লেখককে নতুন ভাষা দিয়েছেন। বক্তাকে বাগ্মিতা দিয়েছেন। সর্বসাধারণকে সরল পথের দীক্ষা দিয়েছেন। এক কথায়, তার হাত ধরেই পৃথিবী সভ্যতার যুগে পদার্পণ করেছে। তার এই বহুমুখী তৎপরতা ও অবদান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

নিশ্চয় আপনি (মুহাম্মাদ) সরল পথ প্রদর্শন করেন।[১]

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন নবী। আল্লাহর প্রেরিত দূত। শান্তির বার্তাবাহক। ধনী-গরিব, স্বাধীন-পরাধীন, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, আরব-অনারব—সকলের জন্য রহমত। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।[২]

এই রহমতকে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্যই তিনি সবাইকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ, মানুষ যখন জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ হবে তখনই কেবল সে প্রকৃত শান্তি লাভ করবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

> وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ৫২

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

ওই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ, এই জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো ইহুদী বা খ্রিস্টান যদি আমার ব্যাপারে জেনেও আমার আনীত দ্বীনের ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে নির্ঘাত জাহান্নামবাসী হবে।[১]

তার শৈশব থেকে যৌবনের পরিক্রমা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তিনি সব সময়ই ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। তার ভাষা ছিল মাধুর্যপূর্ণ। ব্যবহার ছিল অমায়িক। এক কথায়, সুমহান চরিত্রের অধিকারী হতে হলে ব্যক্তির মাঝে যে-সকল অনন্য সাধারণ গুণের সমাবেশ ঘটার প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে সে-সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই অনন্য সাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করেই তিনি পবিত্র, পূর্ণাঙ্গ ও মহানুভব মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।

জীবনে কখনোই তার মুখ থেকে কোনো মিথ্যে উচ্চারিত হয়নি। গুরুতর কোনো ভুল বা বিচ্যুতিও প্রকাশিত হয়নি। চারিত্রিক বা নৈতিক স্খলনও ঘটেনি। সকল ঐতিহাসিক সম্মিলিত চেষ্টা করেও তার মধ্যে এধরনের কোনো ত্রুটি খুঁজে বের করতে পারবে না। তিনি ছিলেন বিনয়ী, বিশ্বস্ত, সত্যভাষী ও মহানুভব। এ কারণেই যুবক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন স্বজাতির সবার কাছে নন্দিত ও সমাদৃত।

এজন্য আমরা দেখতে পাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রকাশ্যে নবুওয়াতের ঘোষণা দেন তখন কাফিররা তার বিরোধিতা করলেও সততা ও সত্যবাদিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেনি। তাদের জন্য দ্বীনের দাওয়াত চরম অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও তাকে 'আল আমীন' বা 'বিশ্বস্ত' বলে ডাকতে ভুল করেনি। অধিকন্তু তাদের মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণের ব্যাপারে কেবল তাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছে এবং তার কাছেই গোচ্ছিত রেখেছে। বিবাদ মীমাংসার জন্যও তারই শরণাপন্ন হয়েছে।

মোটকথা, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিত্রিক ও নৈতিক উৎকর্ষে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে ভাবা যায়, নবুওয়াতলাভের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক গুণাবলি ও চারিত্রিক পবিত্রতায় কতটা উন্নতি করেছিলেন!

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১৫৩; হাদীসটি আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

তার এই সুমহান চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।[১]

অবশ্য ইসলাম যখন ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই সততা, সত্যবাদিতা এবং চারিত্রিক শুচিতাই কাফিরদের গাত্রদাহের কারণে পরিণত হয়। তারা ভেতরে ভেতরে অক্ষম ক্রোধে ফেটে পড়ে। কেননা, এই সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাকে মিথ্যে অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত রেখেছিল। তার চারপাশে দুর্লঙ্ঘ্য নিরাপত্তা-বলয় সৃষ্টি করেছিল। আবু সুফিয়ানের মতো ধুরন্ধর ব্যক্তিও নাজাশীর সামনে সত্য স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

[১] সূরা কালাম, আয়াত : ৪